সিটি ও পৌর নির্বাচন: একটি পর্যালোচনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৭ আগস্ট, ২০০৮)

গত ৪ আগস্ট চারটি সিটি কর্পোরেশন ও নয়টি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের অধীনে এগুলোই ছিল প্রথম নির্বাচন। তাই এগুলো নিয়ে যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, তেমনি ছিল সংশয় ও শঙ্কা। অনেকে আশা করেছিল যে, নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ হবে। আর অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসবে – সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীন হবেন। আবার অনেকের মধ্যে আশঙ্কা ছিল যে, সরকার তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি নীল-নকশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং সিটি ও পৌর নির্বাচনে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং এ কারণে তারা জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধী। এ সকল আকাঙ্ক্ষা-আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, 'সুজন' নির্বাচনের দিনে ভোটদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে না, বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। তাই আমাদের এ পর্যালোচনা গতানুগতিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট নয়, বরং পুরো প্রক্রিয়ারই একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ।

নির্বাচনে প্রার্থী ও জয়ীদের ইতিবৃত্ত

মোট প্রার্থী ও চূড়ান্ত প্রার্থী

চারটি সিটি কর্পোরেশন ও নয়টি পৌরসভায় মোট ১,৮২৮ জন ৩ জুলাই মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি সিটি কর্পোরেশনে ৬৬ জন মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। চারটি সিটি কর্পোরেশনে সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ৯১৭ জন এবং সংরক্ষিত আসনের জন্য ১৯৮ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। নয়টি পৌরসভায় মেয়র পদের জন্য ৬৯ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য ৪৫৫ এবং সংরক্ষিত আসনের জন্য ১২৩ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন।

৬ ও ৭ জুলাই মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয়। বাছাই পর্বে চারটি সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে ৪ জনের (খুলনায়), সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২৩ (খুলনায় ১৮, সিলেটে ৫) জন ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩ (খুলনায় ১, সিলেটে ২) জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। পরবর্তীতে ১৩ জুলাই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত চারটি সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে ১৬ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ১৪১ জন ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে একজন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ফলে সিটি কর্পোরেশন সমূহের চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে, মেয়র পদের জন্য ৪৬ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ৭৫৩ জন ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ১৯৪ জন।

পক্ষান্তরে মনোনয়নপত্র বাছাই পর্বে নয়টি পৌরসভায় মেয়র পদে একজন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে তিনজন ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। পরবর্তীতে ১৩ জুলাই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত চারটি পৌরসভায় মেয়র পদে নয়জন এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২৬ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ফলে পৌরসভায় চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে, মেয়র পদের জন্য ৫৯ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ৪২৬ জন ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ১২২ জন।

চারটি সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের ৭৫৬ জন কাউন্সিলরদের মধ্যে মোট ১৭ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন খুলনায় তিন জন, বরিশালে ছয় জন এবং রাজশাহীতে আট জন – সিলেটে কোন নারী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন নি। পৌরসভার সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র দুইজন – চুয়াডাঙ্গায় একজন এবং শ্রীপুরে আরেকজন। এদের মধ্যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মাত্র দুইজন – রুবিনা আক্তার ও নাজনীন আক্তার – নির্বাচিত হয়েছেন। পৌরসভা সাধারণ আসন থেকে কোন নারী নির্বাচিত হন নি।

সিটি মেয়র পদপ্রার্থীদের ইতিবৃত্ত

হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, চার সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদপ্রার্থীদের ৬০ শতাংশের বেশির শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর। ২২ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক এবং অন্যান্যদের তার নিম্নের। নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে রাজশাহীর জনাব লিটনের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএ অনার্স, খুলনার জনাব খালেকের বিএ, বরিশালের জনাব হিরণের বিএ-এলএলবি এবং সিলেটের জনাব কামরানের এইচএসসি।

পেশার দিক থেকে চারটি সিটি কর্পোরেশনে মেয়র প্রার্থীদের ৬০ শতাংশের বেশি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। ১৫ শতাংশ আইন ব্যবসার সাথে জড়িত। বাকিরা কৃষি ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পেশায় জড়িত। উল্লেখ্য যে, কিছু প্রার্থী বেকার ও গৃহ শিক্ষক বলে

নিজেদেরকে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। নির্বাচনী মেয়রদের মধ্যে তিনজন ব্যবসায় নিয়োজিত বলে হলফনামায় তথ্য দিয়েছেন। জনাব খালেক পেশার কোন উল্লেখ না করে লিখেছেন যে, তার বর্তমানে কোন ব্যবসা নেই।

চারটি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে ৪৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারীদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন – সিলেটের সাবেক মেয়র জনাব বদর উদ্দীন আহমদ (কামরান) – কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। অন্য তিনজন সিটি মেয়রও কারারুদ্ধ এবং তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নি। রাজশাহী ও খুলনার ভারপ্রাপ্ত মেয়র অবশ্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। বরিশালের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মনোনয়নপত্র জমা দিলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। এ সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সিলেটে মেয়র কামরান জয়লাভ করেন।

রাজশাহীর এবারের মেয়র পদপ্রার্থীদের মধ্যে আগের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন প্রার্থী ছিলেন না, যদিও জনাব মোঃ রেজাউল নবী দুদু কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। খুলনার মেয়র পদপ্রার্থীদের মধ্যে মাত্র দুইজন – এম ফিরোজ আহমদ ও এ্যড. এনায়েত আলী – আগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হয়েছিলেন। জনাব মণিরুজ্জামান মণি অবশ্য গত নির্বাচনে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বরিশালের মেয়র পদপ্রার্থীদের মধ্যে তিনজন – মোঃ এনায়েন পীর খান, মোঃ এবায়েদুল হক চাঁন, আহসান হাবীব কামাল – আগের নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিলেটে মেয়র পদপ্রার্থীদের মধ্যে দুইজন – জনাব আফম কামাল ও জনাব আব্দুল হক (এম এ হক) – ২০০৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী এবং বিজিত সকল প্রার্থীদের মধ্যে কেউ নির্বাচিত হন নি।

চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৪৬ জন প্রার্থীদের মধ্যে, তাদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, ১২ জন বা ২৬ শতাংশ অতীতে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন এবং তারা এ সকল মামলা থেকে অব্যহতি পেয়েছেন। বর্তমানে নয়জনের বা ২০ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজ্জুকৃত আছে, যাদের মধ্যে পূর্বে খালাসপ্রাপ্ত তিনজন অন্তর্ভূক্ত। নির্বাচিত চার মেয়রের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধেই বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে – শুধুমাত্র রাজশাহীর জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই। বরিশালের জনাব হিরনের বিরুদ্ধে দুইটি এবং খুলনার জনাব তালুকদার আব্দুল খালেকের বিরুদ্ধে পাঁচটি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। সিলেটের জনাব কামরানের বিরুদ্ধে চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তিনি এখন কাররুদ্ধ।

চারজন সিটি মেয়রের মধ্যে সব কয়জনই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক মনোনীত। বরিশালের মেয়র পদে আওয়ামী লীগের জনাব হিরন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিডিপি সমর্থিত জনাব সরফুদ্দিন আহমদকে মাত্র ৭৮৪ ভোটে পরাজিত করলেও, সিলেটের সাবেক মেয়র এবং বর্তমানে কারারুদ্ধ জনাব কামরান তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আ ফ ম কামালকে ৮৩,৩৩৯ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, জনাব কামরানের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ অন্য ১৪ জন প্রার্থীর সকলের প্রাপ্ত ভোটের চেয়েও বেশি। রাজশাহীর ও খুলনার নবনির্বাচিত মেয়রগণ জিতেছেন যথাক্রমে ২৪,৯৪০ ও ১৮,৮২৩ ভোটের ব্যবধানে।

সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলরদের ইতিবৃত্ত

সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনে কাউন্সিলর পদে গত টার্মের মোট ১১৮ জন নির্বাচিতদের মধ্য থেকে ৯৪ জন ৪ আগস্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ৬১ জন অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জয়ী হন। অর্থাৎ গত টার্মের সাধারণ আসনে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং এসকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্য থেকে ৬৫ শতাংশ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, নবনির্বাচিত সাধারণ আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৬১ জন বা ৫২ শতাংশ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তাই দেখা যায় যে, সাধারণ আসনের কাউন্সিলরদের মেজরিটি বা ৫২ শতাংশ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত গতবারের একমাত্র নারী কাউন্সিলর বরিশালের নিগার সুলতানা হনুফা আবারো সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে পরাজিত হন।

একইভাবে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে গত টার্মে নির্বাচিতদের মধ্য থেকে ৩৩ জন ৪ আগস্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৪ জন জয়ী হন। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনের মোট ৩৯ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩৩ জনই বা ৮৫ শতাংশ নির্বাচনে পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন এবং মাত্র ১৪ জন বা ৩৬ শতাংশ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

চার সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনে নির্বাচিত ১১৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩২ জন বা ২৭ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ২৬ জন বা ২২ শতাংশ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ ২৪ জন বা ২০ শতাংশ। নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের নিচে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে ৩৩ জনের বা ২৮ শতাংশের। এদের মধ্যে তিনজন হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করেন নি।

সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনে ৩৯ জন নির্বাচিতের মধ্যে ২০ জন বা ৫১ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক স্তরের নিচে। বাকিদের মধ্যে মাধ্যমিক পাশ ৮ জন বা ২১ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ৫ জন বা ১৩ শতাংশ। স্নাতক ও তদুর্দ্ধ শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে ৬ জনের বা ১৫ শতাংশের।

সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনে নির্বাচিত ১১৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশই বা ৮১ শতাংশ ব্যবসায়ী। বাকিদের মধ্যে ৭ জন কৃষিকার্যে, চারজন চাকরিতে ও তিনজন আইন পেশায় লিপ্ত। বাকি আটজন অন্যান্য পেশায় লিপ্ত।

সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত সিটি কাউন্সিলরদের ৩৯ জনের মধ্যে ১৬ জন বা ৪১ শতাংশ 'গৃহিনী' পেশা হিসেবে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। সমাজসেবায় সাতজন, আইনপেশায় একজন, চাকুরিতে তিনজন, ব্যবসায় দুইজন নিয়োজিত রয়েছেন। একজন আইনের ছাত্রী। এছাড়া নয়জন পেশা উল্লেখ করেন নি।

চার সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত সাধারণ আসনের ১১৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে মোট ৩০ জনের বা এক চতুর্থাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এদের মধ্যে জেলখানা বা পলাতক অবস্থায় রয়েছেন পাঁচজন। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসন থেকে ২৭ জন নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে ১১ জনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে মামলা রয়েছে, তাদের কেউ কেউ কারাবাস করেছেন এবং দুইজন এখনো কারাগারেই রয়েছেন। বরিশালের সাধারণ আসন থেকে ৩০ জন নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে মামলা রয়েছে পাঁচজনের বিরুদ্ধে। খুলনার ৩১ জন নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের মধ্যে মামলা রয়েছে সাতজনের বিরুদ্ধে, দুইজন কারারুদ্ধ এবং একজন পলাতক অবস্থায় নির্বাচিত হয়েছেন। রাজশাহীর সাতজন নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।

পৌর মেয়র পদপ্রার্থীদের ইতিবৃত্ত

নয়টি পৌরসভার মেয়র পদ প্রার্থীদের ৭০ শতাংশ তাদের হলফনামায় পেশার হিসেবে 'ব্যবসা' উল্লেখ করেছেন। ১৫ শতাংশ কৃষিকাজে জড়িত। বাকিরা অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত।

পৌর মেয়রদের মধ্যে নয়জনই পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। এদের মধ্যে চারজন জয়লাভ করেন, দুপচাঁচিয়ায় মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মানিকগঞ্জের মোঃ রমজান আলী, গোলাপগঞ্জে জাকারিয়া আহমদ ও শ্রীপুরের জনাব আনিসুর রহমান।

মোট ৫৯ জন পৌর মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে ২১ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি মামলা ছিল, যা থেকে তারা অব্যহতি পেয়েছেন। বর্তমানে তাদের ১৩ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজ্জুকৃত রয়েছে। এদের মধ্যে ৯ জনের বিরুদ্ধে অতীতেও মামলা ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে।

নয়টি পৌরসভায় নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। বর্তমানেও পাঁচজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তবে সীতাকুণ্ডের জনাব শফিউল আলম, দুপচাঁচিয়ার জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মানিকগঞ্জের জনাব মোঃ রমজান আলী, গোলাপগঞ্জের জনাব জাকারিয়া আহমদের বিরুদ্ধে অতীতেও মামলা ছিল এখনও রয়েছে। নির্বাচিত পৌর মেয়রদের মধ্যে দুইজন – মানিকগঞ্জের জনাব মোঃ রমজান আলী এবং দুপচাচিয়ার জনাব জাহাঙ্গীর আলম – কারাগার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয়লাভ করেছেন। জাহাঙ্গীর আলম অবশ্য নির্বাচনের আগের দিন জামিনে মুক্তি পান। এছাড়াও গোলাপগঞ্জের জনাব জাকারিয়া আহমদ কিছুদিন আগে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। অর্থাৎ নির্বাচিত পৌর মেয়রদের অধিকাংশই বিতর্কিত।

পৌর কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের ইতিবৃত্ত

সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত পৌর কাউন্সিলরদের ৮১ জনের মধ্যে ৬৭ জন বা ৮৩ শতাংশ 'ব্যবসা' তাদের পেশা হিসেবে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। ১০ জন বা ১২ শতাংশের পেশা কৃষি। বাকিরা অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত, যার মধ্যে একজন চাকুরিজীবী, একজন আইনজীবী ও একজন শ্রমিক বলে দাবি করেছেন। একজন নির্বাচিত কাউন্সিলর পেশা উল্লেখ করেন নি। সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বচিত ২৭ জনের মধ্যে ২০ জন বা ৭৪ শতাংশ 'গৃহিনী' পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দুইজন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বলে দাবি করেছেন।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সিটি ও পৌর মেয়র পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের অনেকেই বিতর্কিত। যে চারজন মেয়র পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন – সিলেটের কামরান, গোলাপগঞ্জের জাকারিয়া আহমদ, মানিকগঞ্জের মোঃ রমজান আলী ও দুপচাচিয়ার জাহাঙ্গীর আলম – তাদের সকলের বিরুদ্ধেই গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এদের দুইজন এখনও কারাগারে এবং একজন – দুপচাচিয়ার জনাব জাহাঙ্গীর আলম – ছয় মাসের সাজাপ্রাপ্ত, যার বিরুদ্ধে বর্তমানে আপিল পেন্ডিং। বস্তুত নয়জন নির্বাচিত সিটি ও পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ২৮ টি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মেজরিটি বা ৫২ শতাংশ পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন এবং তাদের অনেকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চারটি সিটি কর্পোরেশন ও নয়টি পৌরসভা নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বহুলাংশে অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে।

অসম্পূর্ণ ও অসত্য তথ্য প্রদান

সদ্যসমাপ্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের এবং অসত্য তথ্য প্রদানের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের তদন্তে ৫০ জন প্রার্থীর হলফনামায় গুরুতর অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর জনাব মর্তুজা আবেদিনের বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য গোপন ও মিথ্যা তথ্য প্রদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আরো তদন্তের জন্য কমিশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের সহায়তা নেবে।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌর মেয়র পদে ১০৫ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৪৬ জন বা ৪৪ শতাংশ আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন এবং এগুলোর কপি আমরা পেয়েছি, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো আংশিক বা অসম্পূর্ণ। সিটি কর্পোরেশনের ৪৬ জন মেয়র পদপ্রার্থীর মধ্যে ৩০ জন বা ৬৫ শতাংশ আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন। পৌর মেয়র পদপ্রার্থী ৫৯ জনের মধ্যে ১৬ জন বা ২৭ শতাংশ আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন। অর্থাৎ সিটি মেয়র পদপ্রার্থীদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি আয় করদাতা নন।

মেয়র পদপ্রার্থী আয়কর দাতাদের মধ্যে তিনজন ব্যাতীত, এমন তিনজন যারা নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন নি, অন্যদের প্রায় সকলের আয়কর প্রদানের পরিমাণ যৎসামান্য। নির্বাচিত সিটি মেয়রদের মধ্যে দুইজনের আয় করযোগ্য আয়ের নিচে বলে তারা দাবি করেন এবং তারা কোন ট্যাক্স প্রদান করেন নি, যদিও তাদের বড় অঙ্কের সম্পদ রয়েছে। অন্য দুইজনের প্রদত্ত করের পরিমাণও ১০,০০০ থেকে ১৩,০০০ টাকার মধ্যে। পৌর মেয়রদের মধ্যে একমাত্র গোলাপগঞ্জের জাকারিয়া আহমদ ২৫,২৮৯ টাকা আয়কর পরিশোধ করেছেন। নির্বাচিত মেয়রদের অনেকের আয়কর রিটার্নের সাথে হলফনামায় প্রদত্ত সম্পদের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। কয়েকজনের সম্পদের পরিমাণের থেকে দায়-দেনা বেশি বলে দেখা যায়, তবে তারা কিছু সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন নি। হলফনামা অনুযায়ী অনেক মেয়র পদপ্রার্থীর বাৎসরিক আয় ও সম্পদের পরিমাণ অতি সামান্য।

নির্বাচিত মেয়রদের প্রদত্ত আর্থিক তথ্যের মধ্যে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মনে হয় তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত তথ্যগুলো। নির্বাচিত সিটি মেয়রদের যে তিনজনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার থেকে দেখা যায় যে,তাদের গড় মাসিক পারিবারিক খরচ ১০,০০০ থেকে ১৭,০০০ টাকার মধ্যে। গাড়ির গড় মাসিক জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ৩,০০০ থেকে ৪,২০০ টাকা। গড় মাসিক টেলিফোন বিল ৪২৫ থেকে ৫৬১ টাকা এবং গড় মাসিক বিদ্যুৎ বিল ৪৯৮ টাকা থেকে ৯৬৭ টাকা।

সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো ছিল পরবর্তীতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচগুলোর, বিশেষত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ড্রেস রিহার্সেলস্বরূপ। তাই এই সকল নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ করার ওপর সরকার ও নির্বানচন কমিশনের আন্তরিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। এর ওপর আরো নির্ভর করে নির্বাচনী ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা। এক্ষেত্রে কি সরকার ও নির্বাচন কমিশন সফল?

নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার একটি বড় মাপকাঠি নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ৪টি সিটি কর্পোরেশন গড়ে ৭৮.৭৪ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করেছে। এরমধ্যে সর্বোচ্চ ভোট প্রদানের হার ছিল বরিশালে, ৮২.০৩ শতাংশ, আর সর্বনিম্ন ছিল সিলেটে, ৭৫ শতাংশ। পৌরসভার ক্ষেত্রে গড় ভোট প্রদানের হার ছিল ৮৭.৭১ শতাংশ। নয় পৌরসভার মধ্যে বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ভোট পড়েছে সর্বোচ্চ হারে ৯৪.৬৬ শতাংশ এবং সীতাকুণ্ডে পড়েছে সর্বনিম্ন ৮৩.৪০ শতাংশ। প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী এ সকল নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে বৃদ্ধি পেয়েছে নারী ও সংখ্যালঘুদের ভোট প্রদানের হার।

অতীতের নির্বাচনগুলোতে একটি বড় সমস্যা ছিল জাল ভোট প্রদান। এবার জাল ভোট প্রদানের হার ছিল অতি নগণ্য। শোনা যায়, পুরো বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মাত্র একটি জাল ভোট পড়েছিল, তাও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কর্মকর্তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য। জাল ভোট প্রদানের সুযোগ ছিল না বলে ডামি বা জাল প্রার্থীর সমস্যাও ছিল না। জাল ভোটের দৌরাত্ম্য দূর করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা, যা তৈরি নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি বড় অর্জন। তবে, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা অন্তর্ভূক্ত ভোটার নম্বরের সাথে জাতীয় আইডি কার্ডের নম্বরের অমিল থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটারদের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয় এবং কিছু ভোটার ভোট দিতে পারেন নি। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী এদের সংখ্যা মোট ভোটারের তুলনায় অতি নগণ্য।

অন্যবারের তুলনায় নির্বাচনী ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলে অনেকের ধারণা। ব্যয় হ্রাসের একটি বড় কারণ ছিল, শোডাউন, তোরণ নির্মাণ, ভোট ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদিও ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। টাকার বিনিময়ে ভোট ক্রয়-বিক্রয়ের অভিযোগ অনেক স্থান থেকেই উঠেছে, যদিও এগুলো দৃশ্যমান ছিল না।

ভোটগ্রহণও শান্তিপূর্ণ হয়েছে – উল্লেখযোগ্য কোন সহিংসতার ঘটনা ঘটে নি। ভোটারদের হুমকি দেয়ার কিংবা বেলট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটে নি। ভোটারগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। কোথাও, বরিশাল ছাড়া, ভোট গণনার, ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় নি। বরিশালের ভোট গণনার ক্ষেত্রে সমস্যার একটি বড় সম্ভাব্য কারণ ছিল, আমাদের অভিজ্ঞতানুসারে, সংশ্লিষ্ট

নির্বাচনী কর্মকর্তার অযোগ্যতা ও অদক্ষতা। ভোট গণনায় আর কী ঘটেছিল তা আমরা নির্বাচন কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানতে পারব বলে আশা করি। তবে সার্বিক বিবেচনায় ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভায় নির্বাচন ছিল সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য।

বিতর্কিত প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ

১১ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর অনেকেই আশা করেছিল যে, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আসবে এবং ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোতে তা প্রতিফলিত হবে। নির্বাচনে বিতর্কিত ব্যক্তিরা প্রত্যাখ্যাত হবেন এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা অধিকহারে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল আশানুরূপ হয় নি – দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে অভিযুক্ত অনেক ব্যক্তিই স্বাচ্ছন্দে এবং অনেকক্ষেত্রে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। কেন তা হলো?

বিতর্কিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার পেছনে অনেক সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। একটি কারণ হলো, ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখের পর অনেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা দায়ের এবং তাদের অনেককে কারাগারে অন্তরীণ করা হলেও, আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে কোনরূপ গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে নি। অনেকেই ১১ জানুয়ারির পূর্বাবস্থায় – অর্থাৎ রাজনৈতিক হানাহানিতে – ফিরে না যাওয়ার কথা বললেও, হানাহানির মূল কারণ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের, বিরুদ্ধে তারা তেমন সোচ্চার হন নি। ফলে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে নি এবং দুর্বৃত্তরা সামাজিকভাবে ধিকৃতও হন নি। যার কারণ অবশ্য দেশের জনমত সৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশের দলীয় আনুগত্য এবং দলবাজির উর্ধ্বে উঠতে না পারা। তাই দুর্বৃত্তদের মধ্যে কোন অনুশোচনা বা লজ্জাবোধ সৃষ্টি হয় নি, যা তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারতো। অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখের ঘটনার পর বড় বড় কিছু নেতা-নেত্রীদেরকে, যাদেরকে কোনভাবে স্পর্শ করা যাবে না বলে অনেকের ধারণা ছিল, কারাগারে অন্তরীণ করার মত প্রলয়ঙ্করী ঘটনা ঘটলেও, জাতির মানসিকতায় তেমন পরিবর্তন ঘটেনি বলেই মনে হয়।

এছাড়াও আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, কোনরূপ গর্হিত কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তরা স্বেচ্ছায় গণপ্রতিনিধিত্বমূলক বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। আর বিতর্কিত ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ফলে অনেক সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা এগিয়ে আসেন নি। অর্থাৎ সাম্প্রতিক নির্বাচনে 'গ্রাসামস্ ল' কাজ করেছে – 'খারাপ' প্রার্থীরা 'ভাল' প্রার্থীদেরকে নির্বাচনী ময়দান থেকে বিতাড়িত করেছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোও বিতর্কিত প্রার্থীদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে পারে নি। যেমন, সরকার অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের মামলা করেছে, কিন্তু এ সকল মামলাগুলো নিস্পত্তি করতে পারে নি। অনেকের মতে, এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকাও সহায়ক ছিল না। নির্বাচন কমিশনও মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করতে পারে নি এবং হলফনামায় অসত্য তথ্য দেয়ার কিংবা তথ্য গোপন করার জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল করে নি। এছাড়াও কমিশন হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের কপি প্রকাশের ব্যাপারে গাফিলতি করেছে। যেমন, আমরা 'সুজনে'র পক্ষ থেকে বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর মাত্র নির্বাচনের আগের দিন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে প্রার্থীদের আয়কর রিটার্নের তথ্য পাই, তাও সে তথ্য ছিল আংশিক। ফলে তথ্যগুলো গণমাধ্যম ও ভোটারদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। এছাড়াও 'সুজন' ব্যতীত অন্য কোন সংগঠন প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ধারাবাহিকভাবে এগুলো বিতরণের এবং এর মাধ্যমে ভোটার সচেতনতা সৃষ্টির কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। গণমাধ্যমের জন্যও ছিল এটি প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই তাদের পক্ষেও গভীর অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি করা অনেকক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নি।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তারা এখন পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি। বরং তারা দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদেরকেও মনোনয়ন ও সমর্থন প্রদান করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনৈতিক দলের উদ্যোগী ভূমিকা ছাড়া রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা অসম্ভব।

বিতর্কিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার পেছনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের বিদ্যমান সামন্তবাদী প্রথা। সামন্তবাদী প্রথায় একটি পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা রাজতন্ত্রের অধীনে রাজা-প্রজার সম্পর্কের সমতূল্য। এ প্রথায় সাধারণ জনগণের কোন 'অধিকার' থাকে না, যদিও আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের জন্য অনেকগুলো মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের 'নাগরিক' হিসেবে তারা রাষ্ট্রের মালিক এবং সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষমতার উৎস হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও দেশের অধিকাংশ জনগণ, বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখনও রাষ্ট্রের 'মালিকে' পরিণত হতে পারে নি – তারা এখনও প্রভূতুল্য শাসকদের করুণার পাত্রই রয়ে গিয়েছে। ফলে যে সকল নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তাদের প্রাপ্য, তা তারা পায় না। তাদের ন্যায্য অধিকারগুলো অর্জনের জন্য তাদের অবলম্বনের আশ্রয় নিতে হয়। বস্তুত, পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষকদের কৃপা বা অনুগ্রহের কারণেই তারা বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, পৃষ্ঠপোষকরা তাদেরকে নিরাপত্তাও প্রদান করে থাকে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের হয়রানি থেকে রক্ষা করে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিদেশী শাসকরা ছিলেন প্রভূ, আর নেটিভ বা স্বদেশীরা ছিলেন প্রজা। 'সরকার বাহাদুর' শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে অবকাঠামো সৃষ্টির পাশাপাশি প্রজাদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা ও সেবার ব্যবস্থা করতেন। বিদেশী শাসকদের সহযোগী হিসেবে তাদের সৃষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও ভূস্বামীরাও প্রজাদের প্রতি নানাভাবে দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন ও হাসপাতাল-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ

বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করতেন এবং প্রজাদের পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করতেন। আর জমিদার শ্রেণীর এ সকল পৃষ্ঠপোষকদেরকেই ভিক্ষা-অনুদান ও নানা ধরনের কৃপাপ্রাপ্ত প্রজারা অনেকক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতো।

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচিত এবং এতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিধান রাখা হলেও, নাগরিকরা বহুলাংশে এখনও প্রজাই রয়ে গিয়েছে। প্রাপ্য অধিকার দিয়ে তাদেরকে নাগরিক হিসেবে ক্ষমতায়িত করা হয় নি, তাদের নিজেদেরও সে ধরনের মানসিকতা গড়ে ওঠে নি। 'মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন, ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি ...' – জাতীয় সঙ্গীতের এ কথাগুলো তাদের অনেকের কাছে ফাঁকা বুলি বৈ কিছুই নয়। এমনি ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ধরনের ফায়দা দেয়ার মাধ্যমে নব্য প্রভূতে পরিণত হয়েছেন। নির্বাচন তাদের জন্য সভ্য সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে প্রভূত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতা মাত্র, কারণ নির্বাচন পরবর্তীকালে তারা যা-ইচ্ছা-তাই করে পার পেয়ে যেতে পারেন।

মূলত দলবাজি ও ফায়দাবাজির নগ্ন প্রদর্শনীর – দলীয় বিবেচনায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা বিতরণের – কারণে গত দুই সরকারের, বিশেষত গত সরকারের আমলে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক আরো দৃঢ়তর হয়েছে। দলীয় সাধারণ সম্পাদকদেরকে ফায়দা প্রদানের কেন্দ্রবিন্দু স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে এ সম্পর্ককে চলমান রাখা হয়। নানা ধরনের ফায়দা প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রতিককালে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, বিশেষত সরকার দলীয় সংসদ সদস্যগণ তাদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় এক ধরনের জমিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তারা তাদের সমর্থকদেরকে বৈধ-অবৈধ সুযোগ-সুবিধাই প্রদান করেন নি, তাদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছেন। বলাবাহুল্য যে, এ ধরনের দলবাজি ও ফায়দাবাজির কারণে পুরো জাতি, যে জাতি ১৯৯০ সালেও ঐক্যবদ্ধ ছিল, বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ক্রমান্বয়ে অনেকটা অন্ধ দলীয় আনুগত্য সৃষ্টি হয়েছে। এ আনুগত্যকে ধরে রাখার জন্য ফায়দা প্রদানের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের সিম্বলিজম বা প্রতীক – 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ', 'জিয়ার আদর্শ" – ব্যবহার এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত নিজস্ব স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও তা সত্য – অধিকাংশ ভোটার ভোট দেয় তাদেরকেই, যারা তাদেরকে বৈধ-অবৈধ নানান সুযোগ-সুবিধা (নগদপ্রাপ্তি যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) ও নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশে দুইটি দল – বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল – তা প্রদান করতে সক্ষম। তাই অতীতে তারা এ দুইটি দলকেই মূলত ভোট দিয়েছে। ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সততা ও যোগ্যতার বিবেচনা সাধারণ ভোটারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নয়। সদ্যসমাপ্ত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও তাই হয়েছে – ভোটাররা তাদের নব্য প্রভূদেরকেই ভোট দিয়েছে।

কিছু ইতিবাচক দিক

একথা সত্য যে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে পুরানো ধারার রাজনীতির এবং পেট্রোন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কেরই বিজয় হয়েছে। ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের সততা-যোগ্যতা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়নি। বরং প্রার্থীর দলীয় আনুগত্য এবং তাদের পেট্রোন হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতাই – যে বিশ্বাসযোগ্যতা সাধারণ ভোটারদের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষমতার নিদর্শন – অধিকাংশ ভোটারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই বলে আশাবাদী হবার কি কিছুই নেই?

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি ও পৌর নির্বাচনে অনেকগুলো তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, যা আশার আলো বহন করে বলে আমাদের বিশ্বাস। যেমন, এ নির্বাচনগুলোতেই প্রথমবারের মত প্রার্থীদেরকে তাদের নিজেদের অপরাধী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস এবং নিজেদের ও পারিবারিক আয়-সম্পদ এবং দায়-দেনার তথ্য হলফনামার মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রদানের আইনগত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে – অতীতে আদালতের নির্দেশে শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক ছিল। এ বাধ্যবাধকতা অসৎ ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে, যেমনটি ঘটেছিল ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত ফরিদপুর-১ আসনের উপনির্বাচনে।

গত পাঁচটি উপনির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য সুজনের উদ্যোগে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে এ প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা হয়। প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যগুলোর সারাংশ লিফলেট আকারে স্থানীয় সুজন কমিটির উদ্যোগে ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ সকল সারাংশ কিছু স্থানীয় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এভাবে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার এবং তাদের জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগের পথ সুগম হয়।

গত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন থেকে সুজন ভোটারদের সাথে প্রার্থীদের মুখোমুখি অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। পরবর্তীতে পৌরসভা ও জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনেও এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুজনের এবং কয়েকটি গণমাধ্যমের যৌথ উদ্যোগে এবার ১৩টি নির্বাচনী এলাকায়ই মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে বিটিভি ও বিবিসির সহযোগিতায়ও ৪টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্বাচনী সংলাপের আয়োজন করা হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে মেয়র পদ প্রার্থীদেরকে অনেক শক্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় এবং নির্বাচিত হলে ভবিষ্যতে তাদের সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন মুক্ত করার এবং সকল নাগরিক সেবা ভোটারদের কাছে সহজপ্রাপ্য ও সহজলভ্য করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করতে হয়।

সুজন আয়োজিত মুখোমুখি অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত মেয়র পদপ্রার্থীগণ একটি লিখিত অঙ্গিকারনামায় স্বাক্ষর করেন। নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে জেলে থাকা তিনজন ব্যাতীত সকলেই তা করেন। স্বাক্ষরিত অঙ্গিকারনামায় নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল:

- আমি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কাজ করব। নির্বাচনী আচরণবিধিসহ সকল প্রকার বিধি-বিধান মেনে চলব;
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কিনব না;
- ভোটারদের ভয়ভীতি প্রাদর্শন করে ভোট আদায়ের চেষ্টা করব না;
- নিজে সন্ত্রাস করব না বা সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেবো না;
- নির্বাচিত না হলে জয়ী প্রার্থীকে সানন্দে গ্রহণ করব;
- নির্বাচিত না হলেও পৌর এলাকার উন্নয়নে কাজ করব এবং নির্বাচিত পরিষদকে সহায়তা করব;
- নির্বাচিত হলে সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করব এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করব;
- নির্বাচিত হলে পৌরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করব, পৌর এলাকাকে মাদকমুক্ত করব;
- ট্যাক্স আদায়সহ স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহে উদ্যোগী হব এবং এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগাব;
- নির্বাচিত হলে উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন করব;
- নির্বাচিত হলে আমি নারী, মুক্তিযোদ্ধা, পঙ্গু ও অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করব এবং তাদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখব;
- নির্বাচিত হলে আজকের অঙ্গিকারের ভিত্তিতে জনগণের মুখোমুখি হব এবং অঙ্গিকারসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে বা হচ্ছে তার জবাবদিহি করব;
- নির্বাচিত হলে আমি প্রতিবছর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদ, আয়-ব্যয় ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ করব।

শুধু লিখিতই নয়, প্রার্থীগণ পরস্পরের হাত ধরে এ অঙ্গিকারগুলো মৌখিকভাবেও ব্যক্ত করেন, যার ভিডিও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। আনন্দের কথা যে, নির্বাচনের পরও নির্বাচিত মেয়রগণ বিভিন্ন ফোরামে এ সকল অঙ্গিকারের প্রতি পুনরায় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাই তাদের পক্ষে অতীতের ধারার দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিতে ফিরে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হবে, যদিও তা বহুলাংশে নির্ভর করবে সচেতন নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকার ওপর।

গণমাধ্যমও এবার প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেকক্ষেত্রে তারা অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরিরও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অনেকেই এ কাজে সুজনের ওয়েবসাইট (www.shujan.org এবং www.votebd.org), যাতে সংশ্লিষ্ট তথ্য আইন-বিধি ও প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে, ব্যবহার করে। ফলে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার পক্ষে প্রচারণা চলে, যদিও নির্বাচনী ফলাফলে তার কোন বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি। তবুও এ সকল প্রচেষ্টা আশার আলো জাগায় এবং এ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ও আরো জোরদার হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসার পথ সুগম হবে। তবে, এই জন্য প্রয়োজন হবে আমাদের বিরাজমান সামন্তবাদী প্রথার পরিবর্তন এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়ন।

আশার কথা যে, নাগরিক সচেতনতার স্তরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নীত হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন: মুখোমুখি অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত নাগরিকগণ দাঁড়িয়ে ও হাত তুলে শপথ করেন যে: "আমি ভোটকে পবিত্র আমানত মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করব না। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মিথ্যাচারী, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী, ঋণ খেলাপী, বিল খেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেব না।" নিঃসন্দেহে ভোটারদের, অন্তত কিছু ভোটারদের মানসিকতার এমন পরিবর্তন আমাদেরকে আশাবাদী না করে পারে না। তবে ভবিষ্যতের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন সাধন।

উপসংহার

সদ্য অনুষ্ঠিত চারটি সিটি কর্পোরেশন ও নয়টি পৌরসভা সম্পর্কে সার্বজনিন আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এগুলো সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, তাই হয়েছে বলা চলে। তাই নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ফলাফলকে প্রভাবিত করার কোন দৃশ্যমান আলামত পাওয়া যায় নি, যদিও বরিশালের ভোট গণনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা আশা করি যে, নির্বাচন কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট থেকে বরিশালের বিষয়টি সম্পর্কে সকল সন্দেহ দূরীভূত হবে।

তবে অর্থবহতার – নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানোন্নয়নের – বিবেচনায় নির্বাচনী ফলাফলগুলো অনেককে হতাশ করেছে। ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত অনেক প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন এবং অনেকে জয়ীও হয়েছেন। যে চারজন প্রার্থী জেলে থাকাকালীন কিংবা জেল থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের সকলেই জয়ী হয়েছেন। অন্য নয় জন বিজয়ী মেয়রদের মধ্যে ২৮ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। নির্বাচিতদের মধ্যে একজন ইতোমধ্যে ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নির্বাচিত মেয়রের পেশা ব্যবসা। নির্বাচিত সিটি মেয়রদের তিনজনের পেশাই ব্যবসা এবং চতুর্থজন পেশার জায়গায় 'বর্তমানে কোন ব্যবসা নাই' বলে উল্লেখ করেছেন। পৌর মেয়রদেরও অধিকাংশই ব্যাবসায়ী। সিটি কর্পোরেশনের ও পৌরসভার সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের বেলায়ও তা সত্য। অর্থাৎ শুধু আমাদের জাতীয় সংসদই নয়, স্থানীয় পর্যায়েও রাজনীতি এবং নির্বাচিত পদগুলো ক্রমাগতভাবে ব্যবসায়িদের করায়ত্ত হয়ে গিয়েছে।

চারটি সিটি কর্পোরেশনের ৪৬ জন মেয়র পদপ্রার্থীদের অধিকাংশই ১৬ জন আয়কর রিটার্ন জমা দেন নি। যারা জমা দিয়েছেন তাদের অনেকেও আয়কর যোগ্য আয় নেই বলে আয়কর প্রদান করেন নি। নির্বাচিত সিটি মেয়রদের মধ্যে দুই জনের অবস্থাই এমন। যারা আয়কর দিয়েছেন, তাদের মধ্যে দুইজন ব্যাতীত অন্য সবারই কর প্রদানের পরিমাণ নগণ্য। যারা আয়কর দেন নি কিংবা সামান্য পরিমাণের আয়কর পরিশোধ করেছেন, তাদের অনেকেরই নিজের এবং নির্ভরশীলদের বড় অঙ্কের সম্পদ রয়েছে। এছাড়াও প্রার্থীদের জীবনযাত্রা প্রণালীর – মাসিক পারিবারিক খরচ, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি – যে তথ্য তাদের আয়কর রিটার্নে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য। অর্থাৎ অনেকেক্ষেত্রেই প্রার্থীরা অসত্য তথ্য দিয়েছেন কিংবা তথ্য গোপন করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আগে এ সকল তথ্য খতিয়ে দেখে নি এবং তথ্যের অসঙ্গতির জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি, যদিও গণমাধ্যমের রিপোর্ট কমিশন এখন তদন্ত করছে এবং অনেকের হলফনামায় ও আয়কর রিটার্নে অসঙ্গতি পেয়েছে। তদন্তের ক্ষেত্রে তারা এনবিআর ও পুলিশের সহযোগিতা নিচ্ছে। সবচেয়ে ভালো হতো, নির্বাচনের আগে তথ্য গোপনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, কারণ নির্বাচন পরবর্তীকালে জয়ীদের নির্বাচন বাতিল করা সহজ হবে না।

নির্বাচন কমিশনের বড় ব্যর্থতা ছিল তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে। প্রথমত, কমিশন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পূর্বে হলফনামার কপি প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কমিশনের মতে, যারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, তাদের তথ্য প্রকাশ 'অনৈতিক' এবং তাদের হলফনামার কপি প্রকাশ করা হয় নি। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং জনস্বার্থ পরিপন্থি। এছাড়াও কমিশন প্রার্থীদের আয়কর রিটার্নের কপি প্রকাশ করা শুরু করে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে, তাও সংবাদ সম্মেলন করে আমাদের প্রতিবাদের পর। আরো দুঃখজনক যে, বরিশাল থেকে আমরা আয়কর রিটার্নের কপি পেয়েছি নির্বাচনের আগের দিন – এগুলোও আবার অসম্পূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিত শিথিলতা এবং তথ্যের অসঙ্গতির জন্য প্রার্থীতা বাতিলের ব্যাপারে উদ্যোগহীনতা, যদিও সুজনের পক্ষ থেকে এবং গণমাধ্যমের রিপোর্টে তথ্য গোপন ও অসত্য তথ্য প্রদানের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

নির্বাচনকালে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে নাগরিক সংলাপ ও প্রার্থী-ভোটার মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনেক প্রচার প্রচারণাও চালানো হয়। তবুও অনেক বিতর্কিত প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। এর অন্যতম কারণ হলো, আমাদের বিরাজমান সামন্তবাদী পেট্রোন-ক্লায়েন্ট বা প্রভূ-করুণার পাত্রের সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের প্রভূদেরকেই, যারা তাদেরকে নানা সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা প্রদান করতে সক্ষম, ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। এছাড়াও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোও বিতর্কিত প্রার্থীদেরকে মনোনয়ন বা সমর্থন প্রদান করতে দ্বিধা করে নি। সচেতন নাগরিক সমাজও অন্যায়ের বিপক্ষে এবং সৎ, যোগ্য প্রার্থীর পক্ষে তেমন সোচ্চার হন নি। সরকারও যাদের বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ উত্থাপন করেছে কিংবা যাদেরকে অন্তরীণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে পারে নি। প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য প্রকাশ এবং যাচাই-বাছাই করে তথ্য গোপনকারীর কিংবা অসত্য তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে কমিশনের ঢিলেমিও অযোগ্য প্রার্থীর নির্বাচনে সহায়তা করেছে।

সৎ, যোগ্য প্রার্থীর পক্ষে আওয়াজ ওঠা সত্ত্বেও, অধিক সংখ্যক বিতর্কিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যাপারে হতাশ হওয়ার কোন অবকাশ নেই বলে আমরা মনে করি। এবারকার নির্বাচনে প্রথমবারের মত প্রার্থীদের পক্ষ থেকে হলফনামা আকারে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুজন ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থী ভোটার মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গণমাধ্যমও এ ব্যাপারে অধিকহারে আগ্রহ প্রদর্শন করছে। প্রার্থীরাও নির্বাচনের আগে বিরাজমান দুনীতি-দুর্বৃত্তায়নের পন্থা পরিহারের মৌখিক ও লিখিত অঙ্গিকার করেছে এবং নির্বাচন পরবর্তীকালে বিজয়ীরা এ সকল অঙ্গিকার বাস্তবায়িত করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ সকল ইতিবাচক বিষয় আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদিভাবে আশান্বিত না করে পারে না।